এই সেই পাঁচমুড়ো!

বিস্ময়ের ঘোর কাটে না কিছুতেই। বহু দূর নয়, ঘর থেকে দুইপা দূরে সেই 'মাটির ঘোড়ার দেশে' ঘুরে এসে বিস্মিত লেখক সৌমেন মিত্র।

এখনো ঘোরের মধ্যে আছি। পাথুরে রাস্তা, ঘন জঙ্গল, শাল-সেগুন, ঝিরঝিরে নদী, টেরাকোটা মন্দির, মুকুটমণিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পাঁচমুড়ো ... সবই যেন অলৌকিকভাবে ছেয়ে আছে আমাকে।

আমরা বিষ্ণুপুর থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় প্রাতরাশ করে আমাদের ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে বেরোলাম পাঁচমুড়োর পথে। প্রায় ৪৫ মিনিটের রাস্তা। আমাদের যে নিয়ে গেল তার বয়স মাত্র ২৪। গাড়ী চালানোর হাত অসাধারণ। অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে পেরোতে লাগলাম পিচ রাস্তা। কখনো মেঠো পথ, দুপাশে দৃশ্য বদলে যেতে লাগলো দ্রুত। কখনো ধান ক্ষেত, কখনো ঘন জঙ্গল, কখনো পুকুর, কখনো ঝোপঝাড়, আর মাঝে মাঝে মাটিমাখা লোকালয়। সেখানে চায়ের দোকান, সব্জি বিক্রি হচ্ছে, গ্রাম্য মানুষের আনাগোনা। 'যদি হই চোরকাঁটা', 'আমার পুজার ফুল' এইসব গানের পশরা। গাড়িতে আমরা চা এনেছিলাম। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা খাওয়া হলো ধীরে সুস্থে। তারপর আবার পথ চলা ...। প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ আমাদের ড্রাইভার ওর বিশাল গাড়িটা গাঁক করে দাঁড় করিয়ে দিলো একটা মাটির বাড়ির দাওয়ার সামনে। অতটা রাস্তা যেতে যেতে একটু ঘুমের চোখটাও এসে গেছিল আমাদের। ঝট করে ঘুমটা কেটে গেল।

আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ডানদিকে একটা দাওয়াওয়ালা মাটির বাড়ি, যেখানে অজস্র মাটির টেরাকোটা জিনিস। বামদিকে একটা খোলা জায়গা, দেওয়াল। দেওয়ালে মুনমুন সেন, শ্রীমতী দেব বর্মা। সামনে দোতলা সম্পন্ন বাড়ি। ইংরাজি T-এর মতো দুদিকে রাস্তা চলে গেছে। একটা বামদিকে আর একটা ডানদিকে। ড্রাইভার বললো : ডানদিকে কুম্ভকার পাড়া, ভেতরে অনেক বাড়িঘর। আপনারা নিজের মতো ঘুরুন, আমি স্কুলের পাশের মাঠে গাড়ি রাখছি।

যে দাওয়ার সামনে আমরা নামলাম, সেটা দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী বেড়িয়ে এলেন। বিভিন্ন আকারের ঘোড়া, অদ্ভুত সুন্দর তার বেশ। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, ঘোড়ার মতো আরো দুটো প্রাণী আছে সামনে, আমরা তার কথা জানিই না। একটা হাতি আর একটা ষাঁড়। আমরাতো ওই ষাঁড়ের রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। এত্ত সুন্দর! এ তো কোথাও পাবো না। কালো কুচকুচে ষাঁড়। মাটির রঙের ঘোড়া, কোথাও কালো ঘোড়া, গোল গোল হাতি। সবই নকশায় ভরপুর। কিছু কাঁচা

মাটির প্লেটও আছে। ওনাদের পদবি কুম্ভকার। নামটা মনে নেই। সেই ভদ্রলোক, বছর ৩৫-৪০ হবে, যত্ন করে বোঝালেন কিভাবে মাটির কাজ করা হয়। ঘোড়ার দাম বেশি না। ৫০ টাকাতেও একজোড়া ঘোড়া পাওয়া যায়, আবার ১৫০০ টাকাতেও। কিন্তু মুশকিল হলো প্যাকেজিং-এর। যাঁরা আসেন তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যান। অবাক চোখে তাকিয়ে সব ছবি তোলেন। কিন্তু ওই ১০-১৫ কেজি জিনিস বহন করতে হবে ভেবে ল্যাজ তুলে পালিয়ে যান। তাই ওদের বিক্রি বিক্ষিপ্ত। তাই তাঁরা ছোটোখাটো জিনিস তৈরি করতে শুরু করেছেন। বিশেষত, হার, মালা, দুল, চুড়ি, বালা। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারাই আসল ক্রেতা।

ওনার কাছ থেকে বেরিয়ে আমরা একটা সম্পন্ন বাড়ির দাওয়ায় উঠলাম। সেখানে আশি বছরের এক বৃদ্ধ, আর তাঁর ছেলে। দাদু বললেন উনি তেমন আর কাজ করতে পারেন না। একটু সাহায্য করেন। দীর্ঘ ষাট বছর উনি অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু লাভের মুখ দেখেননি কোনোদিন। মাটির কাজ ছাড়াও তাঁর ধান-জমি আছে। বর্ষাকালে ওনার কাজ হয় না, চাষ করেন। গরমে, শীতে, বসন্তে কাজ হয় ভালো। কিন্তু এতো পরিশ্রম, তার মূল্য নেই। ইদানিং কয়েক বছর পাঁচমুড়ো মেলা হচ্ছে। সেখানে একটু আধটু বিক্রি হয়। বাকিটা পাইকারি বিক্রি। ওনার দাওয়ায় একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, মা মনসার চালি।

অসাধারণ জিনিস। সত্যি কথা বলতে কি সুন্দরবন বাদ দিয়ে মনসার এত ব্যাপক প্রচার আমি আর কোথাও দেখিনি। মা মনসার চালি হল – মাঝখানে একটা মূর্তি থাকবে, তাকে ঘিরে সাপ, ওপরে নিচে অনেক ছোটো ছোটো মূর্তি, দেবদেবী ও মানুষের। তারা পূজার্চনায় রত। এই বৃদ্ধের ছেলেরা বেশ সম্পন্ন। ওনাদের বাড়িতে ঢুকলাম। কি জিনিস!! না, হার দুল, পঞ্চপ্রদীপ, ধুপদানি এইসব ...। একটা সহজ সত্য বুঝলাম। বাড়ি ভাগ হলে যারা রাস্তার সামনের অংশ পায় তাদের বিক্রি সবচেয়ে ভালো হয় ও তারা বড়লোক হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আর পিছনের ভাইয়ের ভাগে জোটে বঞ্চনা। আমি আর আমার বন্ধু ছাদে চলে

গিয়ে বাড়িটা একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম। প্রয়োজনভিত্তিক অল্প কিছু ছোটোখাটো জিনিস কেনা হলো।

তারপর আমরা সেখান থেকে বেড়িয়ে আরো একটা কুম্ভকারের বাড়ি গেলাম। নিত্যানন্দ কুম্ভকার। তাঁদের দাওয়া আবার ভিতরমুখী। সেখানে ওনার ছেলে একটা ব্রহ্মামূর্তি বানাচ্ছে। আর তা দেখে আমরা থ! এত্ত সুন্দর! পাঁচমুড়ো না এলে শুধু ধারণা থাকতো এরা কেবল ঘোড়া বানায়। সে ধারণা ভেঙ্গে গেল। সেই বাড়িতেও একটা-দুটো ধুপদানি কেনা হলো। শিল্পীরা তাঁদের মতো করে প্যাকেট করে দিলেন। প্যাকিংটা ভালো না, ভেতরে খড় দিয়ে জিনিসগুলো খবরের কাগজে মুড়ে দিলেন। বাড়ির একদিকে মাটির স্তুপ, অন্যদিকে মাটির চাকা, আর গোল গর্ত করে পোড়ানোর জায়গা। এ-রকমটা প্রত্যেক বাড়িতেই আছে। বৃদ্ধ কুম্ভকারের নাতনি বসে বসে ছাঁচ থেকে বিভিন্ন মুখ বানাচ্ছে দ্রুতগতিতে। হয়তো ওর বয়স চার বা পাঁচ। আমার বন্ধুর মেয়ের বয়সি। সে পাশে বসে গেল সেটা দেখতে। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলো সেই মেয়ের গুণপনা। খুব মজা পেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে মেঠো রাস্তা। রাস্তার দুপাশে সার সার দাওয়া। নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সব মাটির জিনিস বানাচ্ছে। ডিসপ্লে করা স্তুপাকার ঘোড়া, মনসার চালি। যত ভেতরে যাচ্ছি তত হাতির সংখ্যা বাড়ছে। এবার আমরা এক অতি বৃদ্ধ মানুষের ভাঙা মাটির দাওয়ায় থমকে গেলাম। আমার চোখ আটকে গেল কয়েকটা ঘোড়ায়। এতক্ষণ যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে আমার স্ত্রী বলল : একটা ঘোড়া নিয়েই নাও। দোনোমোনো করতে করতে কিনেই ফেললাম একজোড়া ঘোড়া। ১৬০ টাকায়। সেই বৃদ্ধ মানুষটি আমার বন্ধুর মেয়েকে আদর করে একটি ছোট্ট হাতি দিল। বুঝলাম, লোকটা কেন এখনো মাটির বাড়িতে থাকে।

এইরকম ভাবেই আমাদের কেটে গেল প্রায় দুই ঘন্টা। আমি প্রচুর ছবি তুললাম। তীব্র রোদ, তার মধ্যে সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে। এবার ফেরার পালা। আমার চোখে তখনো পাঁচমুড়োর রেশ।

- ছবিগুলি লেখকের নিজের তোলা।